স্মৃতির আখরে খুলনা

স্মৃতির আখরে খুলনা

সংকলন ও সম্পাদনা

বিভূতিভূষণ মণ্ডল

KOBI PROKASHANI

স্মৃতির আখরে খুলনা
সংকলন ও সম্পাদনা : বিভূতিভূষণ মণ্ডল

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০২৬

প্রকাশক
সজল আহমেদ
কবি প্রকাশনী ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট
২৫৩-২৫৪ ড. কুদরত-ই-খুদা রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
সব্যসাচী হাজরা

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস
৩৩/৩৪/৪ আজিমপুর রোড লালবাগ ঢাকা ১২১১

ভারতে পরিবেশক
অভিযান বুক ক্যাফে কথাপ্রকাশ ঢাকা বুকস বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং বাতিঘর কলকাতা

মূল্য ৯৫০ টাকা

Smritir Akhore Khulna edited by Bibhutibhushan Mondal Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market 253-254 Dr. Kudrat-e-Khuda Road Katabon Dhaka 1205 First Edition: January 2026
Phone: 02-44617335 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bKash)
Price: 950 Taka RS: 950 US 45 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN 978-984-29140-6-5

ঘরে বসে কবি প্রকাশনীর যেকোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com or www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

স্মৃতির আখরে খুলনা

উৎসর্গ

কথাসাহিত্যিক শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়
অধ্যাপক অসিতবরণ ঘোষ
কথাসাহিত্যিক হাসান আজিজুল হক
চলচ্চিত্রকার তানভীর মোকাম্মেল
শ্রদ্ধাস্পদেষু

স্মৃতির আখরে খুলনা

ভূমিকা

রেল স্টেশনটা সকালবেলার রোদে ঝলমল করছে। প্ল্যাটফর্মের ওপরেই একটি কৃষ্ণচূড়া গাছ। নীচে নেমে এলেই দেখা যাবে স্টেশনের নাম—খুলনা। সিমেন্টের স্ল্যাবে বাংলা আর ইংরেজিতে লেখা। সাইডিংয়ে মালগাড়ি দাঁড়িয়ে। পাশেই ভৈরবের বুক ঝকঝক করছে রোদে। সেখানে দাঁড়ানো নৌকা থেকে ঝুড়ি ভরে বরফচাপা ইলিশ এসে উঠছে মালগাড়িতে। যাবে কলকাতায়। কয়েকটা লঞ্চ দাঁড়িয়ে। তাদের পাশে ফ্লোরিকান নামে একটি স্টিমার দাঁড়িয়ে। স্টিমারটা সন্ধেবেলা বরিশাল রওনা হবে। যাবার সময় তার ডান হাতে পড়বে রূপসা নদী। এই নদীটির রূপ আছে। কিন্তু বর্ষাকালে সে খুব ভয়ংকর হয়ে ওঠে। তার জল গিয়ে পড়েছে সিপসা নদীতে। এই নদীর নাম খুলনা শহরের লোক শুনেছে। চোখে দেখেনি। অনেক দূরে। এই সিপসা গিয়ে পড়েছে বঙ্গোপসাগরে। খুলনা শহরের আকাশের পাখিরা নিশ্চয়ই অতদূর উড়ে গিয়ে সিপসা নদীর বঙ্গোপসাগরে পড়া দেখতে পায় না। ভৈরবের বুকে উড়ে বেড়ানো শঙ্খচিলের দল নিশ্চয় শহরটাকে আড়ে বহরে সবটা দেখতে পায়। কলকাতা থেকে ছুটে আসা রেললাইন শিরোমণি, দৌলতপুর কলেজ, খালিশপুর স্টেশন হয়ে খুলনা স্টেশনে এসে শেষ। পাশেই ভৈরবের বুকে স্টিমারঘাট, লঞ্চঘাট। আরেকটা সীমানায় রূপসা নদী। ভৈরবের সঙ্গে যেখানটায় রূপসা মিশেছে—সেই ক্রসিংয়ের কাছাকাছি খুলনা জেলা স্কুল, পুলিশ লাইন, বড় মসজিদ, ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট, জেলা জজের বাংলোবাড়ি। এর পরেই পুবদিকে এগোলে যে কোনো শহরে যেমন থাকে—ঠিক তেমনই—জেলখানা, হাসপাতাল, আদালত, খেলার মাঠ, গেরস্থপাড়া, ব্যাংকবাড়ি, পার্ক, ধর্মসভা, কবরখানা, শ্মশান, বাজার—আরও আরও স্কুল। গাছপালা। পিচরাস্তা। মিউনিসিপ্যালটির অফিস, নাট্যমন্দির।

[*আলো নেই*, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, পৃ. ৩৫]

শৈশবে গ্রামের পাঠশালায় গুরুমশাই যখন আমাদের নাম-ঠিকানা শুদ্ধভাবে বলতে শেখাতেন এবং সঠিকভাবে লেখার মক্‌শো করাতেন তখন আমরা বলতাম এবং লিখতাম 'জেলা—খুলনা'। সেই আমার প্রথম খুলনার নাম এবং শব্দটির সাথে পরিচয়। শৈশবে পৃথিবীটা স্বভাবতই এবং সর্বার্থেই ক্ষুদ্র থাকে। অভিজ্ঞতাও থাকে ক্ষুদ্রতম। গ্রাম, গ্রামের মাঠ-ঘাট-খাল-বিল-হাটবাজার, আত্মীয় পরিজন, পাড়া প্রতিবেশী, কিছু চেনাজানা মানুষ, খুব বেশি হলে পার্শ্ববর্তী দু'চারটে গ্রামের বাইরে তেমন কিছু জানাশোনা বা দেখা হয়ে ওঠে না। আমাদের শৈশবে নৌকা ছাড়া আর কোনো যানবাহনের সাথে দেখা মেলেনি। টেলিভিশন তখনও অনেক দূরে। গ্রামে হাতে গোনা দু'একটি বাড়িতে কেবল রেডিও শোনা যেত। আমাদেরও 'কনিয়ন' নামে একটি রেডিও

ছিল। আমার দাদুর উপহার। সন্ধেবেলা বিবিসির খবর শুনতে পাড়ার লোক এসে জড়ো হতো। খবর শোনা ছাড়াও বাড়ির বড়োরা বিভিন্ন বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান শুনতেন। ঘোষকের ঘোষণা শুনতাম : রেডিও বাংলাদেশ, খুলনা। বেতার-রহস্য নিয়ে শিশুমনে কৌতূহলের অন্ত ছিল না। কিন্তু মনে গেঁথে গিয়েছিল 'খুলনা' শব্দটি। কেননা, পাঠশালার গুরুমশাই শিখিয়েছেন 'জেলা—খুলনা'। খবরের কাগজ তখন গ্রামাঞ্চলে ছিল স্বপ্নেরও অতীত। শৈশবের সেই দিনগুলিতে 'খুলনা' বহু দূরের রহস্যময় একটি জায়গা বলে মনে হতো। আবার 'আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে' যেমন খুশি তেমন ভেবে নিতেও বাধা ছিল না। কোনোদিনও স্কুলে না-যাওয়া, সাত বছর বয়সে স্বামীর বউ হয়ে আসা আমার ঠাকুরমা আয়নামতি আমাকে বলতেন : 'ভাইদা, বড় হয়ে তোমার কিন্তু খুলনায় পড়তি যাতি হবানে।' তখন পর্যন্ত তিনি নিজেও খুলনা শহর দেখেননি। জমি নিয়ে মামলা সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনে বাগেরহাট শহর পর্যন্ত গিয়েছেন। তিনি হয়তো আমাকে বাগেরহাটে পড়তে যাওয়ার কথা বলতে পারতেন। কিন্তু কী ভেবে তিনি খুলনার কথা বলতেন কে জানে! তবে তাঁর উৎসাহ দানের মধ্যে দূরদর্শিতার পরিচয় ছিল যা আমার শিশুচোখে স্বপ্ন এঁকে দিত। আমাদের গ্রামের বাড়ির দক্ষিণ দিকে, দিগন্তবিস্তৃত মাঠের বুক চিরে, পাকিস্তান শাসনের শেষপর্বে 'ঘসিয়াখালি চ্যানেল' নামে একটি নদী খনন করে পূর্ব দিকে পায়েলহারা এবং পশ্চিমদিকের কুমারখালি নদীকে জুড়ে দিয়ে খুলনা থেকে ঢাকা কিংবা ঢাকা থেকে খুলনাগামী নৌপথের দূরত্ব কমিয়ে আনা হয়। কৃত্রিমভাবে তৈরি এই নদীকে 'ঘসিয়াখালি চ্যানেল' নামে বইপত্রে উল্লেখ করা হয়ে থাকলেও স্থানীয়রা এটিকে প্ল্যান বা কাটানদী বলে থাকে। নদীটি ড্রেজার দিয়ে খননের পূর্বে কোদাল দিয়ে কাটা হয়েছিল। সন্নিহিত এলাকার সাধারণ মানুষ ছাড়াও বাইরে থেকে আনা শত শত শ্রমিক এই নদীখননে অংশ নিয়েছিল। প্রথমে কোদাল দিয়ে কাটা হয়েছিল বলেই হয়তো এটির নামকরণ হয়েছিল কাটানদী। আবার সরকারি উদ্যোগে পরিকল্পনা বা প্ল্যান করে কাটা হয়েছিল বলে নদীটির আরেক নাম প্ল্যান। নদীটি ক্রমে খরস্রোতা এবং প্রশস্ত হতে থাকে। এই নদীটিরই উত্তর পাড়ে আমাদের মরিচবুনিয়া পাড়া তথা বড় সন্ন্যাসী নামক গ্রাম। ছেলেবেলায় অবাক বিস্ময়ে তীরে দাঁড়িয়ে দেখতাম এই নদী দিয়ে তেলবাহী জাহাজ এবং মালবাহী কার্গো যাতায়াত করতে। আর দেখতাম রাজকীয় ভঙ্গিতে জলের রাজ-পরিবহন যাত্রীবাহী স্টিমার, দ্রুত গতির কারণে রকেট নামেও অভিহিত, যাতায়াত করতে। বিশাল দুটি চাকায় জল তোলপাড় করে রাজহাঁসের মতো এগিয়ে চলা সেইসব স্টিমারের নাম ছিল—গাজী, লেপচা, টার্ন, অস্ট্রিচ, কিউই, মাহমুদ প্রভৃতি। আমাদের বাড়ি থেকে এইসব স্টিমারের বিশাল ভোঁ শোনা যেত। বড়দের কাছে শুনতাম, এই স্টিমারগুলো ঢাকা থেকে খুলনা কিংবা/এবং খুলনা থেকে ঢাকা যাতায়াত করে। কবি শঙ্খ ঘোষ তাঁর *ইছামতীর মশা* নামক ভ্রমণকাহিনিতে এই কাটানদী দিয়ে স্টিমারে চেপে খুলনা থেকে হুলারহাট যাবার কথা লিখেছেন। এই স্টিমারও আমাকে মনে মনে খুলনায় নিয়ে যেত।

মাধ্যমিক পাস করে ব্রজলাল কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক পড়ার মানসে খুলনায় আসার প্রথম দিনটিকে আমার 'স্বপ্নযাত্রা' বলে মনে হয়েছিল। এ কথা মনে করে এখন এই

পরিণত বয়সে হাসি পেলেও তখন আমার মতো নিতান্তই মফস্বলের একটি কিশোরের কাছে এটাই ছিল স্বাভাবিক। খুলনার যাত্রাপথে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখছিলাম আর বইতে পড়া এবং লোকমুখে শোনা বিভিন্ন বিবরণচিত্র মিলিয়ে নিচ্ছিলাম। ফেরির বিড়ম্বনা এড়াতে অনেক যাত্রীই ছৈ-দেওয়া খেয়ানৌকায় নদী পার হতো। বাবা-মার সাথে এরকমই একটি টাবুরে নৌকায় রূপসা নদী পার হবার সময় স্কুলের বইতে পড়া জীবনানন্দ দাশের কবিতার চরণ মনে পড়ে গিয়েছিল : 'রূপসার ঘোলা জলে হয়তো কিশোর এক শাদা ছেঁড়া পালে...'। যদিও শীতকালে জোয়ারভাটার সন্ধিক্ষণে প্রায় স্রোতহীন রূপসা নদীর জল তখন তেমন ঘোলা ছিল না বরং যথেষ্ট স্বচ্ছই ছিল। নদীর দু'তীরে তখন সারি সারি তেলবাহী জাহাজ, মালামাল বোঝাই কার্গো নোঙর ফেলে দাঁড়িয়ে। দূরে দূরে গাঙচিল কিংবা শঙ্খচিলের ঝাঁক । রূপসা নদী পেরিয়ে সেই যে খুলনা শহরে প্রবেশ তখন থেকেই শিক্ষাসূত্রে, কর্মসূত্রে এবং জীবনের আরও নানান অনুষঙ্গে খুলনার সাথে নিবিড় বন্ধনে জড়িয়ে পড়ি। শিক্ষার্থী থেকে শিক্ষক, শ্রোতা থেকে বক্তা, পাঠক থেকে লেখক প্রভৃতি ভূমিকা বদলের মধ্য দিয়ে খুলনার সাথে এমনই এক শক্ত গ্রন্থিতে বাঁধা পড়লাম যে, দেশ-গাঁয়ের সাথে সম্পর্ক-সূত্রটি আল্‌গা হতে হতে এক সময় বিচ্ছিন্নই হয়ে গেল। বুঝলাম, এ জীবনে আমার আর খুলনা ছাড়া হলো না। রৌদ্র ও কুয়াশা মেখে, বৃষ্টিতে ভিজে, শিশির মাড়িয়ে, মানুষের সাথে মেলামেশা করে প্রায় সাড়ে তিন দশকের খুলনা-যাপনে আমার অস্তিত্ব যেন খুলনাময় হয়ে উঠল। প্রিয় মহানগরী তিলোত্তমা কলকাতা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে কবিকিশোর সুকান্ত ভট্টাচার্য তার মানস-প্রতিমা উপক্রমণিকাকে একটি চিঠিতে যা লিখেছিলেন তা আমার মতো করে লিখলে দাঁড়ায় : 'খুলনাকে আমি ভালোবেসেছি মায়ের মতো, ভালোবেসেছি প্রিয়ার মতো। তার স্পর্শে আমি জেগে উঠেছি। তার স্পর্শে আমি ঘুমিয়ে পড়েছি।' খুলনা হাত বাড়িয়েছে, আমি হাত ধরেছি। খুলনা স্নেহাঞ্চল পেতে দিয়েছে, আমি মাথা রেখেছি। খুলনাতেই যেন 'আকাশভরা সূর্যতারা, বিশ্বভরা প্রাণ'-এর সন্ধান পেয়েছি। পথ হারিয়ে পথ খুঁজে গন্তব্যে পৌঁছানোর মতো খুলনার অলিতে গলিতে হারাতে হারাতে নিজেকেই খুঁজে পেয়েছি। জীবনের আশা-নিরাশা, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি, সাফল্য-ব্যর্থতা, আনন্দ-বেদনা, মিলন-বিরহ, উত্থান-পতন, রাগ-অনুরাগ সবকিছু মিলিয়ে আমার জীবনপাত্রকে ভরিয়ে দিয়েছে খুলনা। একটু একটু করে আমি যেন খুলনাতেই লীন হয়ে গেছি। আবার এমনটিও মনে হয়, খুলনা নিজেই যেন একটি মহাগ্রন্থ। সে যেন একটি একটি করে পৃষ্ঠা মেলে ধরেছে আমার চোখের সামনে। আমি খুলনাকে পাঠ করেছি।

এথেন্স, প্যারিস, রোম, লন্ডন, নিউইয়র্ক, কলকাতা কিংবা ঢাকার মতো প্রসিদ্ধ না হলেও বাংলার, এমনকি অখণ্ড ভারতের শিল্প-সাহিত্য-রাজনীতি-অর্থনীতি-শিক্ষা-চিকিৎসা-বিজ্ঞান প্রভৃতি ক্ষেত্রে খুলনার ভূমিকা নিতান্ত তুচ্ছ নয়। ব্রিটিশ ভারতের প্রথম রাজধানী কলকাতার নিকটবর্তী হওয়াতে খুলনা নামক ভৌগোলিক ভূ-খণ্ড কিংবা শহরটি নানান কারণে গুরুত্ব লাভ করেছে। ব্রিটিশ শাসনামলে ইংরেজ শাসক, রাজকর্মচারী, ভূস্বামী, ব্যবসায়ী এমনকি সাধারণ ইংরেজও খুলনায় অবস্থান করেছেন। তাদের নামাংকিত সড়ক ও প্রতিষ্ঠান আজও তাদের স্মৃতির স্বাক্ষর বহন করছে।

জগদ্বিখ্যাত বিজ্ঞানী আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, কথাসাহিত্যিক কাজী ইমদাদুল হক, বাংলাভাষায় আঞ্চলিক ইতিহাস রচনার অন্যতম পথিকৃৎ সতীশচন্দ্র মিত্র, বাংলার প্রথম চিত্রশিল্প বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা চিত্রশিল্পী শশিভূষণ পাল, ভারতবিখ্যাত গায়িকা যূথিকা রায়, নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, আধুনিক খুলনা শহরের রূপকার মহেন্দ্রনাথ ঘোষ, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন, গীতিকার শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, কথাসাহিত্যিক শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, অভিনেত্রী করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়, আঙুলের ছাপ বা ফিঙ্গারপ্রিন্টের উদ্ভাবক কাজী আজিজুল হক, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চলচ্চিত্রকার তানভীর মোকাম্মেল প্রমুখ খুলনারই কৃতীসন্তান। সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ডাক্তার কৃষ্ণধন ঘোষ, নাট্যকার ও গীতিকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, কথাশিল্পী আবু ইসহাক প্রমুখ খুলনায় প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করেছেন। পিতার কর্মসূত্রে বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, সংগীতাচার্য দিলীপকুমার রায়, অর্থনীতিবিদ ভবতোষ দত্তের শৈশবের কিছুটা সময় কাটে খুলনায়। বিভিন্ন সময়ে খুলনায় এসেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কাজী নজরুল ইসলাম, জীবনানন্দ দাশ, রমেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, মনোজ বসু, জসীমউদ্‌দীন, ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী সান্যাল, শচীন দেববর্মন, শৈলজারঞ্জন মজুমদার, শান্তিদেব ঘোষ, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, উৎপলা সেন, মেহেদী হাসান, শাঁওলি মিত্র, অম্লান দত্ত, মনোজ মিত্র প্রমুখ। অসমর্থিত সূত্রে এমন খবরও শোনা যায় যে, পঞ্চাশের দশকের কোনো এক সময়ে ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলী খাঁও খুলনায় এসেছিলেন। ব্রিটিশ আমল থেকে একাত্তর পূর্ববর্তী সময়ে রাজনীতিবিদদের মধ্যে খুলনায় এসেছেন মহাত্মা গান্ধী, সুভাষচন্দ্র বসু, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ব্যারিস্টার আবদুল রসুল, অরবিন্দ ঘোষ, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, স্যার আজিজুল হক, হুমায়ুন কবীর, জ্যোতি বসু, মুকুন্দবিহারী মল্লিক, যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল, ফাতেমা জিন্নাহ, শেখ মুজিবুর রহমান প্রমুখ। রাজনীতির সূত্র ধরেই বলা যায়, অখণ্ড ভারত এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামসহ বিভিন্ন স্বাধিকার আন্দোলনে খুলনার রয়েছে গৌরবদীপ্ত ইতিহাস। বাংলার এবং পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নরের মধ্যে এসেছেন স্যার ই বেকার, স্যার জন রবার্ট হার্বার্ট, লর্ড লিটন, স্যার ফ্রেডারিক বোর্ন প্রমুখ। এসেছেন ব্রিটিশ রাজকবি টেড হিউজেস। বিভিন্ন সময়ে যে সকল বিশিষ্টজন খুলনায় এসেছেন, এই সংকলনের বিভিন্ন লেখকের স্মৃতিকথায় তাঁদের নাম এবং আগমনের হেতু জানা যায়। এবং কারও কারও লেখায় অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত বিবরণও পাওয়া যায়। খুলনার সাথে বৈবাহিক সূত্রে আত্মীয় রবীন্দ্রনাথ এবং জীবনানন্দ দাশ। আবার রবীন্দ্রনাথের পূর্বপুরুষের আদি বাসস্থান খুলনার রূপসা উপজেলার পিঠাভোগ গ্রামে। কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর ছাত্র এবং পরে সহকর্মী ছিলেন খুলনার মহেশ্বরপাশা গ্রামের শরৎচন্দ্র মজুমদার। তাঁরই ছেলে, খুলনার ব্রজলাল কলেজের গণিতের অধ্যাপক সুবোধচন্দ্র মজুমদার ছিলেন বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর ছাত্র। কলকাতার খেলাৎচন্দ্র ঘোষ ইনস্টিটিউটের শিক্ষক, প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছাত্র ছিলেন খুলনার বিশিষ্ট অভিনেতা ও বাচিকশিল্পী লোহিতকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়। এতসব

বিশিষ্ট মানুষ প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে খুলনার গৌরবের সঙ্গে জড়িয়ে আছেন। আরেকটি পরম শ্লাঘার বিষয় এই যে, এঁদের কারও কারও স্মৃতিকথা, আত্মজীবনী বা অন্য কোনো রচনায় খুলনার উল্লেখ পাওয়া যায়—কারও বইয়ের গোটা একটি অধ্যায়, কারও লেখার দু'একটি অনুচ্ছেদে, কারও বা দু'একটি বাক্যে। পাশাপাশি চরম পরিতাপেরও একটি বিষয় হলো, যাদের রচনায় অবশ্যম্ভাবীরূপে খুলনার প্রসঙ্গ থাকার কথা ছিল তাঁদের রচনায় খুলনা সামান্যই আছে কিংবা একেবারেই নেই।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে কিছুকাল খুলনায় কর্মরত ছিলেন। তাঁর রচিত প্রথম বাংলা উপন্যাস এবং বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক উপন্যাস *দুর্গেশনন্দিনী* (১৮৬৫) খুলনাতেই রচিত বলে গবেষকদের দাবি। তাঁর *কপালকুণ্ডলা* (১৮৬৬) উপন্যাসেও খুলনার সুন্দরবন সন্নিহিত এলাকার ছায়াপাত ঘটেছে বলেই ধারণা কোনো কোনো গবেষকের। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের কোনো রচনার মধ্যেই 'খুলনা' শব্দটির উল্লেখ পর্যন্ত নেই। এমনকি পরবর্তীকালে তাঁর ব্যক্তিগত যে পত্রাবলি প্রকাশিত হয়েছে সেগুলোর মধ্যেও কোনো প্রসঙ্গেই খুলনার নামটি নেই। বঙ্কিমচন্দ্রের এই 'খুলনা-রহস্য' সত্যিই রহস্যময়। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ও কিছুকাল খুলনায় চাকরি করেছেন। খুলনার নাট্যনিকেতনের সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল, এখানে তিনি নিজেও নাটকে অভিনয় করেছেন, অভিনয়ের প্রয়োজনে নাটকও লিখেছেন। কিন্তু তাঁর রচনাবলির মধ্যে কোথাও খুলনার উল্লেখ নেই। তাঁর পুত্র সংগীতসাধক দিলীপকুমার রায় শৈশবে বাবার সাথে কিছুকাল খুলনায় এসে বসবাস করেছেন। তাঁর বিপুলায়তন গ্রন্থ *স্মৃতিচারণ* (২০১১)-এ একটি বাক্যে শুধু খুলনার নামটি লিখেছেন—'এরপরে পিতৃদেবের সঙ্গে খুলনায় ও গয়ায় গিয়ে কিছুদিন থাকি (পৃ. ২৫)।' বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ঘোষের *আত্মকাহিনী*তে খুলনার নামমাত্র উল্লেখ পাওয়া গেলেও তাঁর সহোদর অরবিন্দ ঘোষের রচনাবলিতে কোথাও খুলনার উল্লেখ নেই। খুলনার সন্নিকটে সর্বতোভাবে প্রসিদ্ধ গ্রাম সেনহাটির সন্তান, বাংলা সাহিত্যে নীতিকবিতার অন্যতম প্রধান কবি, *সদ্ভাবশতক* (১৮৬১) খ্যাত কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার একটি আত্মজীবনী লিখেছিলেন। সেই গ্রন্থের শুরুতে তাঁর জন্মস্থানের পরিচয় দিতে গিয়ে খুলনার নামোল্লেখ করলেও গোটা গ্রন্থের কোথাও সেইভাবে খুলনার প্রসঙ্গ নেই। থাকলেও তা এতটাই প্রচ্ছন্ন যে, সেই বিবরণ থেকে খুলনাকে চিহ্নিত করা যায় না। সেনহাটি গ্রামের আরেক কৃতীসন্তান, বিখ্যাত নাট্যকার *সিরাজ-উদ-দৌলা* নাটক খ্যাত শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কোনো রচনাতেই খুলনাকে দেখতে পাওয়া যায় না। খুলনার দেশবিখ্যাত ব্রজলাল কলেজে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের কয়েকজন বিশিষ্ট সারথি বিভিন্ন সময়ে অধ্যাপনা করতে এলেও তাদের অধিকাংশেরই রচনায় খুলনা সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য কোনো তথ্য বা স্মৃতিচারণা পাওয়া যায় না। মাইকেল মধুসূদন দত্তের ভ্রাতুষ্পুত্রী কবি মানকুমারী বসুর জীবনের একটি অধ্যায় খুলনায় অতিবাহিত হলেও তাঁর রচনায় খুলনা নেই। এইসব নেতিবাচক উদাহরণের বিপরীতে ইতিবাচক তথ্যও কম নেই। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, জীবনানন্দ দাশ, সমরেশ বসু, গৌরকিশোর ঘোষ, মনোজ বসু, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, দেবেশ রায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, আবুবকর সিদ্দিক, প্রফুল্ল রায়, হাসান আজিজুল হক,

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, ভগীরথ মিশ্র, অমর মিত্র, তানভীর মোকাম্মেল, সমীরণ দাস, কপিলকৃষ্ণ ঠাকুর, মিহির মুখোপাধ্যায় প্রমুখ লেখকের গল্প কিংবা উপন্যাসে সংক্ষিপ্ত কিংবা অপেক্ষাকৃত বিস্তারিতভাবে খুলনার প্রসঙ্গ এসেছে। বাংলাভাষী ইংরেজি-লেখক অমিতাভ ঘোষের *The Shadow Lines* (২০১৯) এবং *The Hungry Tide* (২০২০) উপন্যাসেও খুলনার উল্লেখ পাওয়া যায়। খুলনার ভূমিপুত্র প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের *আলো নেই* (২০১৭) উপন্যাসের কাহিনি-বিস্তার ঘটেছে খুলনাকে কেন্দ্রে রেখেই। বেদূঈন সামাদের *একাত্তরের মুক্তিসংগ্রাম* (২০০০) উপন্যাসের পটভূমিই খুলনা, খুলনা শহর। চাণক্য সেনের *পিতা পুত্রকে* (২০০৪) নামক আত্মজৈবনিক উপন্যাসের বিস্তৃত প্রেক্ষাপট জুড়েই রয়েছে খুলনা শহর।

*স্মৃতির আখরে খুলনা*য় সত্যেন সেন, নীলিমা ইব্রাহিম, সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত এবং দীপা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুটি করে রচনা সংকলিত হয়েছে। সত্যেন সেনের দুটি রচনাই খুলনার ভিন্ন দুটি অঞ্চলের ঘটনা নিয়ে লেখা। কিন্তু দুটি লেখাই সংযুক্তভাবে খুলনাকেই ধারণ করে আছে। নীলিমা ইব্রাহিম *বিন্দু বিসর্গ* (১৯৯১) নামে আত্মজীবনীটি লেখার দেড় দশক পূর্বে ঢাকাস্থ 'খুলনা সমিতির স্মারকপত্র' *সুন্দরবন* (১৯৭৫)-এর জন্য *অতীতের স্মৃতি ও শহর খুলনা* নামে স্মৃতিকথাটি লিখেছিলেন। পরবর্তীকালে বিস্তারিতভাবে আত্মজীবনীটি লিখলেও প্রথম স্মৃতিকথাটি সম্পূর্ণভাবে ওই আত্মজীবনীতে বিলীন হয়ে যায়নি, সামান্য দু'একটি ঘটনার আভাস রয়েছে মাত্র। সুতরাং লেখাটির একটি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রয়েছে। সে কারণেই তাঁর দুটি লেখা সংকলিত হলো। সুখরঞ্জন সেনগুপ্তর দুটি লেখার সময়, বিষয় এবং ভাষা ভিন্ন। দীপা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুটি লেখাই ভিন্ন ভিন্ন সময়ে তৈরি। দুটি লেখার মধ্যেই একটি যোগসূত্র রয়েছে। নীলিমা ইব্রাহিমের প্রথম লেখাটিতে কাজী নজরুল ইসলামের খুলনায় এসে সেনহাটিতে গিয়ে যূথিকা রায়কে গান শেখাবার যে তথ্য পরিবেশিত হয়েছে পরবর্তীকালে যূথিকা রায়ের একাধিক সাক্ষাৎকার এবং তাঁর আত্মজীবনী *আজও মনে পড়ে* (২০১৩) বইটি সেই তথ্যকে খারিজ করে দেয়। নীলিমা ইব্রাহিমের পরিবেশিত তথ্য সংশোধন বা পরিবর্তনের অধিকার বা সুযোগ আমাদের নেই। শুধু পাঠকের অবগতি এবং বিবেচনার জন্য দুটি তথ্য পাশাপাশি উল্লেখ করে রাখা হলো। এই সংকলনের যে-সকল লেখা সরাসরি পাওয়া গিয়েছে বা গৃহীত হয়েছে সেই সকল লেখার শিরোনাম সংশ্লিষ্ট লেখকেরই দেওয়া। এই সকল লেখা সাধারণত পত্র-পত্রিকা-স্মারকগ্রন্থ বা এই জাতীয় উৎস থেকে গৃহীত হয়েছে। আবার কিছু লেখা লেখকের আত্মজীবনী বা স্মৃতিকথা থেকে নির্দিষ্ট অংশটুকু নির্বাচন করে সংকলিত হয়েছে। এইভাবে সংকলিত লেখাগুলোর শিরোনাম সংকলক-সম্পাদকের দেওয়া। প্রতিটি লেখারই উৎসনির্দেশ করা হয়েছে। এখানে একটি কথা বিশেষভাবে বলার আছে যে, কোনো কোনো লেখকের দীর্ঘ কোনো রচনার মধ্যে যেখানে যেখানে খুলনার প্রসঙ্গ এসেছে শুধু সেইটুকুই সংকলিত হয়েছে। ধরা যাক, সেই দীর্ঘ লেখার একটি বা পরপর কয়েকটি অনুচ্ছেদে খুলনার প্রসঙ্গ আছে। তারপর ভিন্ন প্রসঙ্গ। তারপর আবারও খুলনা প্রসঙ্গ। আমরা সেই ভিন্ন প্রসঙ্গগুলো বাদ দিয়ে খুলনা-সংশ্লিষ্ট অংশগুলো জুড়ে দিয়ে একটি ধারাক্রম রক্ষার চেষ্টা করেছি। মূল রচনাটি পড়া না থাকলে সংকলক-

সম্পাদকের এই কারিগরি বিদ্যা পাঠকের কাছে ধরা নাও পড়তে পারে। অঙ্গুলিমেয় কয়েকটি নতুন লেখা বাদে এই সংকলনের সব লেখাই পুরনো। নিজস্ব তাগিদ, ভালোলাগা এবং ভালোবাসা থেকেই লেখকরা তাদের লেখাগুলো লিখেছেন। অবশ্য এই ক্ষেত্রে কারও না কারও তাগিদ থাকলেও থাকতে পারে। সে যা-ই হোক, খুলনা নিয়ে তাঁরা তাঁদের অভিজ্ঞতা, স্মৃতি এবং সমকালের কথাই লিখেছেন। এই সংকলনের দুটি লেখার লেখকের নাম পাওয়া যায়নি। ১৯৪৭ থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত কলকাতার *যুগান্তর* পত্রিকায় *ছেড়ে আসা গ্রাম* নামে পূর্ববাংলার ১৮টি জেলার ৬৪টি গ্রাম থেকে ভূমিপুত্র-কন্যাদের পশ্চিমবাংলায় চলে আসার বৃত্তান্ত ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। বলাই বাহুল্য, এরা দাঙ্গা এবং দেশভাগের শিকার। *যুগান্তর* পত্রিকার ওই পাতাটি সম্পাদনা করতেন বিক্রমপুরের ভূমিপুত্র দক্ষিণারঞ্জন বসু। প্রতিটি লেখার সাথেই লেখকের নাম থাকত। এই লেখাগুলো *ছেড়ে আসা গ্রাম* নামে গ্রন্থভুক্ত হয়ে সর্বশেষ সংস্করণে (২০২২) প্রকাশিত হবার সময় কী এক জাদুমন্ত্রে নামগুলো উধাও হয়ে যায়। কেবল বইটির সম্পাদক হিসেবে দক্ষিণারঞ্জন বসুর নামটি মুদ্রিত হয়। যে সকল পাঠক-গবেষক *যুগান্তর* পত্রিকার পাতায় লেখকদের নামসহ লেখাগুলো দেখেছেন বা পড়েছেন তারা দক্ষিণারঞ্জন বসুর এই কীর্তি (!) দেখে যুগপৎ বিস্মিত এবং লজ্জিত হয়েছেন। দক্ষিণারঞ্জনের দাক্ষিণ্যে আমরা লেখকের নামের জায়গায় 'অজ্ঞাত' লিখতে বাধ্য হয়েছি। প্রতিটি লেখায়ই লেখকের বানানরীতি অপরিবর্তিত রাখার চেষ্টা করা হয়েছে।

যাঁদের লেখা এই বইতে সংকলিত হলো তাঁরা সাধারণ পরিচয়ে 'লেখক' হলেও তাঁদের কারও কারও পেশাগত বা কর্মগত একটি নির্দিষ্ট পরিচয়ও আছে। কেউ কেউ শুধুই লেখক অর্থাৎ লেখার বাইরে তাঁদের আর কোনো কাজ বা পেশা নেই। কেউ আছেন সাংবাদিক, কেউ শিক্ষক, কেউ রাজনীতিবিদ, কেউ নাট্যকার, কেউ অভিনেতা, কেউ গীতিকার, কেউ সংগীতশিল্পী, কেউ চিকিৎসক। পেশাগত জীবন ও জগতের কথা তাঁদের লেখায় প্রাধান্য পাবে এটাই স্বাভাবিক। তবে এর বাইরে সমকালীন জীবনব্যবস্থার চিত্রও প্রতিফলিত হয়েছে তাঁদের রচনায়। এই নিরিখে লেখাগুলোকে সমকালের দলিল বা কথাচিত্র বললেও অত্যুক্তি হয় না। স্মৃতিকথা বা আত্মজৈবনিক রচনায় লেখক সরাসরি উপস্থিত থাকেন বলে তথ্যের প্রামাণিক সত্যতা নিশ্চিত হওয়া যায়। আবার অতিরঞ্জনের মধ্য দিয়ে লেখক কখনো কখনো অন্যকে ম্লান করে দিয়ে নিজে উজ্জ্বল হয়ে ওঠার অপপ্রয়াসও চালিয়ে থাকেন। উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে লেখা না হলে, লেখক যদি সত্যের প্রতি দায়বদ্ধ থাকেন তাহলে স্মৃতিকথা বা আত্মজীবনীতে নিরপেক্ষ তথ্যের প্রতিভাস থাকে বলে ধরে নেওয়া হয়। ব্যক্তিগত স্মৃতিকথাই সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের নৈর্ব্যক্তিক তথ্য হয়ে উঠতে পারে। কিছু বিরল ব্যতিক্রম উদাহরণ বাদে স্মৃতিকথা বা আত্মজীবনীতে লেখককে যতটা নিবিড় করে পাওয়া যায়, আর কোনো রচনা-মাধ্যমে সেভাবে সম্ভব হয় না।

খুলনা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের লেখা কোনো স্মৃতিকথা পাওয়া যায় না। যদিও কথাপ্রসঙ্গে বিভিন্ন মানুষের কাছে তিনি খুলনার কথা বলতেন। তিনি খুলনায় এসেছিলেন, খুলনা রেলস্টেশনে নেমে স্টিমারে চড়ে বরিশালেও গিয়েছিলেন। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রশান্তকুমার পালসহ প্রথিতযশা রবীন্দ্রজীবনীকাররা সেসব

তথ্যের প্রমাণও দিয়েছেন। *হুঙ্কার* কাব্যের রচয়িতা হীরালাল সেনের বিরুদ্ধে সরকারের দায়েরকৃত মামলার সাক্ষ্যদান উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথকে একবার খুলনায় আসতে হয়েছিল। ১৯০৮ সালের ২৪ নভেম্বর রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লেখেন '... এক ভদ্রলোক হুঙ্কার নাম দিয়া কতকগুলি উগ্র কবিতা লিখিয়াছিলেন; আমার অনুমতি না লইয়াই তাহা আমার নামে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। সম্প্রতি খুলনা ন্যাশনাল স্কুলে তিনি শিক্ষকতা করিতেছিলেন, সেখানে রাজদূত তাহাকে রাজদ্রোহের অপরাধে ধরিয়াছে। এই মকদ্দমায় সাক্ষ্য দিবার জন্য আমাকে খুলনায় টানিয়া লইয়া যাইতে পারে পুলিসের নিকট এইরূপ শুনিয়াছি—' [রবীন্দ্রসমগ্র, খণ্ড-২২। চিঠিপত্র, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা, ২০২০, পৃ. ১২৬১]। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আর কোনো বক্তব্য কোথাও পাওয়া যায় না। তিনি যদি এই অভিজ্ঞতার কথাগুলো লিখতেন তাহলে সেটাই খুলনা বিষয়ক তাঁর একটি স্মৃতিকথা হয়ে উঠতে পারত। খুলনার ব্রজলাল কলেজের (তৎকালীন দৌলতপুর হিন্দু একাডেমি) অধ্যাপক ছান্দসিক আচার্য প্রবোধচন্দ্র সেন তাঁর লেখায় রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব বয়ানেই গভীর রসবোধসম্পন্ন একটি অভিজ্ঞতার বিবরণ দিয়েছেন যেটিকে আমরা রবীন্দ্রনাথের খুলনা বিষয়ক একটি স্মৃতিকথা হিসেবেই বিবেচনা করেছি। কাজী নজরুল ইসলামের খুলনায় আগমনের তথ্য-সত্যতা নিয়ে কোনো বিতর্ক নেই। খুলনার দৌলতপুর থানার আঞ্জুমান রোডে 'পল্লীকুটির' নামে যে বাড়িতে তিনি আতিথ্য গ্রহণ করেন কালের ভ্রুকুটি এড়িয়ে সে বাড়িটি এখনও টিকে আছে। বাড়িটি নজরুলস্মৃতি নীরবে বহন করে চলেছে। নজরুলের তিনখানি চিঠিতেই মূলত তাঁর খুলনা ভ্রমণের সাক্ষ্য মেলে। সুস্থ স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারলে নজরুল কখনো হয়তো কোনো স্মৃতিকথা বা আত্মজীবনীতে খুলনা ভ্রমণের কথা লিখতেন। কিন্তু যাঁদের সব রকম সুযোগ সম্ভাবনা এবং ঔচিত্য ছিল তাঁরা কেন লিখলেন না সেই জবাবটি আজ আর জানার উপায় নেই।

স্মৃতিকথার সংকলন বলে আত্মকৈফিয়তটিও স্মৃতিচারণ দিয়ে শুরু করেছিলাম। খুলনায় আসার পর খুলনার ইতিহাস-ঐতিহ্য-শিক্ষা-শিল্প-সাহিত্য-সংগীত-রাজনীতি-অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয় জানার আগ্রহবোধ থেকেই খুলনা সম্পর্কে বিভিন্ন বইপত্র পড়তে থাকি। ফলে খুলনার বিভিন্ন দিক উন্মোচিত হতে থাকে আমার সামনে। এক সময় খুলনার শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি নিয়ে কিছু লিখতেও উৎসাহিত হই। লেখা হয়ে যায় কয়েকটি প্রবন্ধ। তারপর যৌথ কিংবা/এবং এককভাবে গোটাকতক বইও লিখে ফেলি। সেইসব বই লেখার তথ্যানুসন্ধানে গিয়েই *স্মৃতির আখরে খুলনা* ভাবনাটি মাথায় আসে। শুরু হয় আরেক রকম অন্বেষণ। সেই অনুসন্ধানেই পাওয়া গেল এই গ্রন্থের লেখাগুলো। সংকলনভুক্ত লেখাগুলোর কয়েকটি বাদে বাকিগুলো পুরনো এবং পুনর্মুদ্রিত সে আভাস আগেই দেওয়া হয়েছে। তবে সমকালকে ভাবীকালের হাতে তুলে দেবার জন্য কিংবা দুইটি কালপর্বের মধ্যে একটি সেতুবন্ধ তৈরির মানসে কিংবা পূর্ববর্তী সময়কাল থেকে পরবর্তীকালের আর্থসামাজিক রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক পরিবর্তনগুলো চিহ্নিত করার লক্ষ্যে কয়েকটি লেখা এ কালের লেখকদের দিয়ে লিখিয়ে নেওয়া হয়েছে। তবে নতুন লেখার জন্য আহূত বা অনুরুদ্ধ হয়ে সকলেই যে সাড়া দিয়েছেন তা নয়। এমনটি প্রায় সব সংকলনের ক্ষেত্রেই ঘটে থাকে। শেষ পর্যন্ত কারও কারও লেখা কোনো না কোনো

কারণে পাওয়া হয়ে ওঠেনি। হতে পারে লেখকের ব্যস্ততা, হতে পারে অসুস্থতা, হতে পারে ক্রমান্বয়ে আগ্রহ হারিয়ে ফেলা, হতে পারে সম্পাদকের কাজটি শেষ পর্যন্ত সফল না হওয়ার আশঙ্কা কিংবা কাজটিকে গুরুত্বপূর্ণ মনে না হওয়া। এতসব প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে যাঁদের কাছ থেকে নতুন লেখা পেয়েছি তাঁদের অসীম কৃতজ্ঞতা এবং আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। এই সংকলনটি হয়ে উঠতে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে যাঁরা উৎসাহ, সহযোগিতা এবং পরামর্শ দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে আছেন—বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক, আমার শিক্ষক ড. হাবিব আর রহমান, লেখক ও সংগীতশিল্পী, আমার শিক্ষক অধ্যাপক দীপা বন্দ্যোপাধ্যায়, আমার শিক্ষকপ্রতিম অধ্যাপক আনোয়ারুল কাদির, অধ্যাপক ভার্গব বন্দ্যোপাধ্যায়, লেখক-অধ্যাপক সুরঞ্জন রায়, কবি-গীতিকার-গবেষক ড. তপন বাগচী, লেখক ও অধ্যাপক শংকর কুমার মল্লিক, উমেশচন্দ্র পাবলিক লাইব্রেরির গ্রন্থাগারিক অধ্যাপক শ্যামল দেবনাথ, রূপান্তর-এর নির্বাহী পরিচালক স্বপনকুমার গুহ, সাংবাদিক-লেখক-গবেষক গৌরাঙ্গ নন্দী, কথাসাহিত্যিক প্রশান্ত মৃধা, চেতনার সহোদর কবি আব্দুল ওদুদ, দেশভাগচর্চার অন্যতম প্রধান পথিকৃৎ, লেখক-গবেষক-কথাশিল্পী, পশ্চিমবঙ্গের হুগলী জেলার ভদ্রেশ্বর শহরের বাসিন্দা, অগ্রজপ্রতিম মধুময় পাল প্রমুখ। মধুময়দা বইটির নামকরণ করা ছাড়াও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ লেখার হদিস এবং জোগান দিয়েছেন। বইটির ফ্ল্যাপও লিখেছেন। উল্লিখিত সবাইকে পরম শ্রদ্ধা, গভীর কৃতজ্ঞতা এবং আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। দীর্ঘ সময় এবং ধৈর্য ধরে লেখাগুলো কম্পোজ করে দিয়েছেন দৌলতপুরের দেয়ানা নিবাসী স্নেহভাজন দেবাশিষ দে দেবু। তার জন্যও শুভকামনা। তেল-নুন-লাকড়ির হিসেব নিকেশ থেকে যথাসম্ভব ভারমুক্ত রেখে, সম্ভাব্য কিছু প্রাপ্তিযোগ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করে আমাকে আমার 'লেখা লেখা খেলা'র অবসর করে দেন যিনি, তিনি শ্রীমতী শিউলি মণ্ডল। তাঁর প্রতিও আমার অসীম কৃতজ্ঞতা। বাংলাদেশের বিশিষ্ট প্রচ্ছদশিল্পী খুলনার ভূমিপুত্র সব্যসাচী হাজরা আমার পূর্বেকার একাধিক বইয়ের মতো এই বইটিরও চমৎকার প্রচ্ছদ এঁকে দিয়েছেন; কবি প্রকাশনীর স্বত্বাধিকারী, কবি-সম্পাদক-চিত্রনির্মাতা স্নেহভাজন ছাত্র সজল আহমেদ এবারও আমার বইটি প্রকাশের দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন—উভয়কেই ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। জয়তু খুলনা।

বিভূতিভূষণ মণ্ডল

ইংরেজি বিভাগ
শহীদ আবুল কাশেম কলেজ
কৈয়াবাজার, হরিণটানা,
খুলনা।

স্মৃতির আখরে খুলনা

সূচিপত্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—খুলনার আত্মীয়তা • ১৯
প্রফুল্লচন্দ্র রায়—খুলনায় দুর্ভিক্ষ • ২০
বিনোদবিহারী সাধু—আমার লঞ্চব্যবসা • ২২
গোলাম মোস্তফা—খুলনার স্মৃতি • ২৪
কাজী নজরুল ইসলাম—খুলনা ঘুরে এলাম • ২৬
আব্দুল ওহাব সিদ্দিকী—স্মৃতির সাগর তীরে : খুলনা • ২৭
আবুল ফজল—খুলনা জেলা স্কুলের দিনগুলি • ৩৬
সত্যেন সেন—খালিশপুরের কারবালা • ৪৩
ধানচোর • ৪৮
ভবতোষ দত্ত—দৌলতপুরের পাঠশালায় • ৫৫
আবু জাফর শামসুদ্দীন—খুলনার দিনগুলি • ৬০
এ. এফ. এম. আবদুল জলীল—খুলনা সাহিত্য পরিষদ • ৬৫
করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়—বাবার বাড়ির স্মৃতি • ৭৪
শেখ মুজিবুর রহমান—আসা যাওয়ার পথের ধারে • ৭৯
যূথিকা রায়—সেনহাটি • ৮৬
নীলিমা ইব্রাহিম—খুলনার স্মৃতি • ১০২
অতীতের স্মৃতি ও শহর খুলনা • ১২২
চাণক্য সেন—ক্ষণিকের খুলনা • ১২৬
আবুল হোসেন—আমার শৈশবের লীলাভূমি • ১৩৭
নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী—খুলনার জাহাজঘাটা • ১৪৯
ধনঞ্জয় দাশ—স্মৃতিময় খুলনা • ১৫৫
শেখ রাজ্জাক আলী—যখন আইনজীবী ছিলাম • ১৬৬
ক্ষেত্র গুপ্ত—ট্রেন খুলনা ছেড়ে যায় • ১৮২

সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত—The Last Train From Khulna • ১৯০
খুলনা ১৯৭২ • ১৯৩
আনোয়ারা বেগম—মহিলা কলেজের দিনগুলি • ১৯৫
শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—বিদায় খুলনা • ২০৬
শঙ্খ ঘোষ—খুলনার স্টিমার • ২০৭
শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়—আমার ধাত্রীদেবতা • ২০৯
হালিমা খাতুন—খুলনার স্মৃতি • ২৩৩
আবুবকর সিদ্দিক—খুলনা, সাধন সরকার, সন্দীপন • ২৩৯
মলয়া ঘোষ—শৈশবের খুলনা • ২৫৫
নগেন্দ্র দাশ—সূর্যের মুহূর্ত কোনও দিন • ২৫৭
শান্তা সেন—খুলনার স্টিমার • ২৮১
বেগম মাজেদা আলী—নানা রঙের দিনগুলি • ২৮৪
আনিসুজ্জামান—আমরা খুলনায় এলাম • ৩০৬
মনোজ মিত্র—খুলনার স্টেশনে • ৩২১
হাসান আজিজুল হক—যে ভিতরে আসে • ৩২৩
সৈয়দ মনোয়ার আলী—'স্নেহভরা কোলে তব মাগো ...' • ৩৩৫
সাধন চট্টোপাধ্যায়—খুলনার ফুলতলায় • ৩৭০
সুশান্ত সরকার—সুন্দরবন কলেজ, প্রমথনাথ বিশ্বাস এবং • ৩৭২
মিহির সেনগুপ্ত—রূপসাঘাটের বৃত্তান্ত • ৩৮০
ভগীরথ মিশ্র—দক্ষিণডিহির সেই অবিস্মরণীয় সন্ধ্যা • ৩৮৭
দীপা বন্দ্যোপাধ্যায়—স্মৃতি বিস্মৃতির খুলনা • ৩৮৯
খুলনার নববর্ষ : ফিরে দেখা • ৩৯৫
অচিন্ত্যকুমার ভৌমিক—সুন্দরবন সুন্দরমন • ৪০০
আনোয়ারুল কাদির—বেলাশেষের অন্ধকার • ৪০৬
সুশীল সাহা—ঢাকা আছে খুলনা; পাব না? • ৪২১
ভার্গব বন্দ্যোপাধ্যায়—অর্ধেক শৈশব • ৪৩০
প্রদীপন দাশগুপ্ত—স্বপ্ন ও দুঃস্বপ্নের শহর • ৪৪৫
অমর মিত্র—গন্তব্য খুলনার দক্ষিণডিহি • ৪৫৩
বেগম ফেরদৌসী আলী—যখন খুলনায় এলাম • ৪৫৭
হাবিব আর রহমান—খুলনার কিছু স্মৃতি • ৪৭১
তানভীর মোকাম্মেল—স্কুল জীবনের স্মৃতি • ৪৭৯
ঊর্মি রহমান—খুলনার স্মৃতির বাক্স • ৪৮২
ফারুক মঈনউদ্দীন—স্মৃতির পরত খুলে খুলনা • ৪৯৪
সুধাংশু কুমার বল্লভ—খুলনার সমাজিক জীবন—খণ্ডচিত্র • ৫০২
রতন সিদ্দিকী—খুলনা আমার অধীর অধ্যয়ন • ৫১১
প্রশান্ত মৃধা—ছেলেবেলার খুলনা • ৫১৬
অজ্ঞাত—সেনহাটি • ৫২৩
অজ্ঞাত—ডাকাতিয়া • ৫২৮
লেখক পরিচিতি • ৫৩২

খুলনার আত্মীয়তা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[ভূমিকা : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একাধিকবার খুলনায় এসেছেন। তাঁর ছোটগল্প এবং চিঠিতেও খুলনার উল্লেখ পাওয়া যায়। বিভিন্নজনের সাথে আলাপচারিতায়ও তিনি খুলনার প্রসঙ্গ তুলতেন। কিন্তু খুলনা নিয়ে তাঁর কোনো লেখা পাওয়া যায় না। খুলনার দৌলতপুরস্থ হিন্দু একাডেমির (বর্তমান ব্রজলাল কলেজ) বাংলা বিভাগের অধ্যাপক, পরবর্তীকালে শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক আচার্য প্রবোধচন্দ্র সেনের উদ্ধৃতিতে রবীন্দ্রনাথের খুলনা বিষয়ক একটি ক্ষুদ্র স্মৃতিকথা উদ্ধার করা গেল।—সম্পাদক]

তখন আমি ছিলাম খুলনা জেলার দৌলতপুর কলেজের অধ্যাপক। শান্তিনিকেতনে এসে কবিগুরুকে প্রণাম করে বসেছি। তিনি প্রথমেই বললেন—দৌলতপুর জায়গাটা তো বেশ স্বাস্থ্যকর। আমি জানালাম তেমন স্বাস্থ্যকর নয়, অসুখ-বিসুখ যথেষ্ট হয়। তিনি বললেন—তোমাকে দেখে তো তোমার কথার প্রতিবাদ করতেই ইচ্ছা হয়। তখন আমি বেশ হৃষ্টপুষ্ট ছিলাম। বুঝলাম তার প্রতি তিনি ইঙ্গিত করলেন। ... দৌলতপুর প্রসঙ্গে মাঝে মাঝেই তিনি বলতেন—দৌলতপুরের কাছেই তো ফুলতলা গ্রাম, ওখান থেকে আমাদের বাড়ির মেয়েরা এসেছিলেন। একবার বললেন—ওই জায়গার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। তারপরেই বললেন—একবার গিয়েছিলাম ওদিকে (যতদূর স্মরণ হয় বরিশালের নাম করেছিলেন), ফেরার সময় জাহাজ থেকে নেমে খুলনা স্টেশনে ট্রেনে উঠতে হলো। সেবার কী একটা যোগ ছিল, কলকাতায় গঙ্গাস্নানের জন্য ভিড়ে ট্রেনে তিলধারণের জায়গা নেই। ফার্স্ট ক্লাস আর থার্ড ক্লাসে কোনো পার্থক্য রইল না। ফার্স্ট ক্লাসে একটা বেঞ্চিতে আমার বিছানা পাতা ছিল। যাত্রীরা আমার বিছানাতেই বসতে শুরু করল। তারপর এগিয়ে আসতে লাগল আমার কাছে। আমি এক কোণে বসলাম। আমাকে কোণঠাসা করেও শান্তি হলো না। আমার কাছে ঘেঁষে বসে থলি থেকে হুঁকো বের করে ধোঁয়া ছাড়তে লাগল। তখন বুঝলাম, এটা সত্যি সত্যি আমার শালার দেশ, নইলে কি এত ঘনিষ্ঠতা হয়? তারপরে কবির মুখে যে নিঃশব্দ উজ্জ্বল হাসি দেখা গেল তা কখনো ভোলা যায় না।

উৎস : প্রবোধচন্দ্র সেন, *ভোরের পাখি ও অন্যান্য প্রবন্ধ*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃ. ৩২৯-৩৩০।

খুলনায় দুর্ভিক্ষ

প্রফুল্লচন্দ্র রায়

১৯২১ সালে আমি যখন চতুর্থবার ইংল্যান্ড ভ্রমণ করিয়া আসিলাম সে সময় খুলনা জেলার সুন্দরবন অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। কলিকাতায় থাকিয়া আমি অবস্থার গুরুত্ব বুঝিতে পারি নাই। মে মাসে গ্রীষ্মের ছুটির সময় আমি যখন গ্রামে গেলাম, তখন আমার চোখের সম্মুখেই দুর্ভিক্ষের ভীষণতা দেখিতে পাইলাম। পর পর দুই বৎসর অজন্মার ফলেই এই অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল। জনসাধারণের 'মা-বাপ' ম্যাজিস্ট্রেট কালেক্টর এ অবস্থা দেখিয়াও অবিচলিত ছিলেন। কিন্তু সংবাদপত্রে ইহা লইয়া খুব আন্দোলন হইতেছিল। গভর্নমেন্টের চক্ষুকর্ণস্বরূপ ম্যাজিস্ট্রেট এসব বিষয় তুচ্ছ মনে করিতেছিলেন, চারিদিক হইতে অন্নকষ্টের যে হাহাকার উঠিতেছিল, তাহা গ্রাহ্য করা তিনি প্রয়োজন মনে করেন নাই, তিনি তাঁহার সদর অফিসে বসিয়া নিশ্চিন্তমনে যে বিবৃতি প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা লোকে কখনো ভুলিতে পারিবে না। উহা হইতে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিতেছি : 'প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই অপর্যাপ্ত ফল জন্মে, খাল হইতে ছোট ছোট ছেলেরাও মাছ ধরিতে পারে এবং চাহিলেই একরূপ বিনামূল্যে দুধ পাওয়া যায়।' ভারতের দুর্ভিক্ষের সঙ্গে যাঁহাদের কিছু পরিচয় আছে, তাঁহারাই জানেন যে, দুধ অসম্ভবরূপে সস্তা হওয়া দুর্ভিক্ষের ভীষণতার লক্ষণ। পিতামাতা তাহাদের শিশুসন্তানকে বঞ্চিত করিয়া দুধ বিক্রয় করে, যদি তাহার পরিবর্তে কিছু চাল পাওয়া যায়। কিন্তু দুধ কিনিবে কে? কেননা ভারতে এখন দুর্ভিক্ষের অর্থ—টাকার দুর্ভিক্ষ। পাঠককে এ কথাও স্মরণ করাইয়া দেওয়া নিষ্প্রয়োজন যে, সুন্দরবন অঞ্চলে ফলের গাছ হয় না এবং ফলের গাছ সেদিকে নাই। এখানে বলা যাইতে পারে যে, ভারতে যখনই কোনো স্থানে বন্যা ও দুর্ভিক্ষ হয়, গভর্নমেন্ট তাঁহাদের সিমলা বা দার্জিলিঙের শৈলবিহার হইতে, প্রথম দুর্গতদের কাতর আবেদনে কর্ণপাত করেন না। ক্রমে যখন সংবাদপত্রে ও সভাসমিতিতে আন্দোলন হইতে থাকে এবং তাহা উপেক্ষা করা কঠিন হইয়া উঠে, আমলাতন্ত্রের প্রভুরা তখন কিঞ্চিৎ অস্বস্তি অনুভব করেন। কিন্তু তখনও 'সরকারি বিবরণ' না পাইলে তাঁহারা কিছু করিতে চাহেন না। সেক্রেটারিয়েট এ বিষয়ে বিভাগীয় কমিশনারের উপর নির্ভর করেন, কেননা তিনিই সংবাদ আদানপ্রদানের ডাকঘর বিশেষ। কমিশনার জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আবার পুলিশের